চিতাবাঘ শহর

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতাবাঘ শহর

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

chitaabaagh shahor
A collection of poems by
Subhro Bandopadhyay

প্রথম প্রকাশ
শরৎ, ২০০৯

প্রকাশক
কৌরব প্রকাশনী
৭এ কাশীনাথ দত্ত রোড
কলকাতা ৭০০০৩৬

প্রচ্ছদ : শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাক্রোপিনোসাইটোসিস নামক কৈষিক খাদ্যগ্রহনের ছবি অবলম্বনে ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে নির্মিত।
শেষ মলাটের আলোকচিত্রঃ ভাস্বতী ঠাকুরতা
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র নিউ সাউথ ওয়েল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের সৌজন্যে প্রাপ্ত

দামঃ ২৫ টাকা

Copyright © 2009 শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
All rights reserved

যোগাযোগঃ subhro_poesia@yahoo.com

সুব্রত সরকার,
মারিফে সান্তিয়াগো বোলানিওস,
আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বইটি ফুন্দাসিওন আন্তোনিও মাচাদো, এস্পানিয়া কর্তৃক প্রদত্ত *আন্তর্জাতিক আন্তোনিও মাচাদো কবিতাবৃত্তি* প্রাপ্ত

FUNDACIÓN
ANTONIO MACHADO

কৃতজ্ঞতা: ফুন্দাসিওন আন্তোনিও মাচাদো, আমালিয়া ইগ্লেসিয়াস সেরনা, মানুয়েল নুনিয়েস এনকাবো, রেসিদেন্সিয়া খুবেনিল গাইয়া নুনিও, রেসিদেন্সিয়া লা মের্সেদ, বিওলেতা মেদিনা, সুসানা আগুস্তিন, ভাস্বতী ঠাকুরতা, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, খেসুস বারেস ইগ্লেসিয়াস, কোন্‌চা বায়েনা, ইনেস আন্দ্রেস সালিনাস, খেরমান আন্দ্রেস, মিরেন্‌চু সালিনাস, খুলিয়ান মায়েস্ত্রা, এবা বারকোনেস যুবেরো, পাত্রিসিয়া মার্তিনস আংখেলিকো

এবং অবশ্যই বিবলিওতেকা পুবলিকা দে সোরিয়া

সূচি

বিশ্বাসী মানুষের কথোপকথন

আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে ৭
ঘুমিয়েছো শব্দের ভিতরে ৮
অক্ষরের দোজখ ৯
একটি শিরনামহীন কবিতা ১০
নিঃসঙ্গতা বিষয়ে ১১
সুখ, আকার, স্তব্ধতা ১২
বিশ্বাসী মানুষের কথোপকথন ১৩
লণ্ঠনের দোজখ ১৪
পুরুষমুখ ১৫
নষ্ট হয়ে যেতে যেতে ১৬
একটু দুরূহ কবিতা ১৭
অপার হয়ে বসে থাকা কবিতাটা ১৮
একটি নিষ্ঠুর কবিতা ২০
ভায়োলেন্স গুচ্ছস্বপ্ন ২২
বিশ্বাসী মানুষের খাতা থেকে ২৩

চিতাবাঘ শহর

চিতাবাঘ শহর ২৪-৪১

বিশ্বাসী মানুষের কথোপকথন

আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে

আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে তোমার শরীর, যেভাবে ঈশ্বরের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়িয়ে নামে পবিত্রতার লালা, একঝলক ভবিষ্যকথন চমকে ওঠে আমাদের পুরনো মাথায়, সেভাবেই এরপর তোমার শরীরের ফাঁকা জায়গাটায় লেখা হতে থাকে অক্ষরগুলো ; জানলার বাইরে যেখানে বাচ্চারা আগুন ধরাচ্ছে শুকনো পাতার পাহাড়ে, শ্রাবণের স্যাঁতসেঁতে জিভের ওপর একফালি রোদ ওদের সাহস, সেইখানে গিয়ে একটু পরে ফেলে আসব এসব

যেগুলো হয়তো না লিখে ছেড়ে দিলে মুখে মুখে বেঁচে থাকত ঠিক...

কলকাতা - সোরিয়া ২০০৭-০৮

ঘুমিয়েছো শব্দের ভিতরে

বাবা কে

জলজ বিকেলগুলো স্মৃতিতে, মিশকালো রাস্তাটায় ধূসর ঘোড়া, তার সারা শরীর পেঁচিয়ে রয়েছে অজস্র সোনালি ফিতে

আমি আস্তে আস্তে দূর থেকে বলতাম, যাও আর যন্ত্রণা পাওয়া ভালো নয় তবু সে জেদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অশক্ত, আকাট

সোনালি ফিতেগুলোকে তার অন্ধকার বুকের ভিতরে পাঠাবার সে কি আকুলতা ; আচ্ছন্ন পেটের ভিতরে

সামনে স্থির কুয়াশাঘেরা কালচে সবুজ উপত্যকা, মাঝে মাঝে ফিরে দ্যাখা আমাদের দিকে অই মাঝখানে সোনালি ফিতেগুলো পুড়ে যাচ্ছে বিকেল ৫.০০, নভেম্বর মাস

মাদ্রিদ, ২০০৭

জল এবং মাটির মধ্যেকার ব্যাপন সম্পর্কের মত অবিচ্ছেদ্য
দাঁড়িয়ে থাকে আঘাত এবং চলচ্ছক্তি, আর এরই মাঝখানে
চিৎকার করে উঠতে চাইলে নদীর মত চকচক করে গলার
ক্ষতচিহ্ন, সব কথা বেরিয়ে যায় এবং সেই বাষ্পের মত
হাওয়ায় আমি আঁকড়ে ধরি পাথর এবং মৃত্যুর অব্যবহিত
আগেও টের পাই আমার হাতে জড়িয়ে রয়েছে অক্ষর আর
মৃত্যুও তারই সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে আছে নিশ্ছিদ্র পাথরে...

সিয়েরাস দে কাদিস, আন্দালুসিয়া ২০০৭

একটি শিরনামহীন কবিতা

চামড়ার তলায় পড়ে আছে কিছু ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ি আর তার পাশ দিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নায় বয়ে যাচ্ছে গরম অ্যালুমিনিয়ামের স্রোত যাকে আমরা যন্ত্রণা বলে ডাকি আর অই তো তার গায়ে ঘুরঘুর করছে কাল্‌চে হাওয়া নাকি মাটি নাকি জল নিহত মুখগুলোকে ঢেকে দেবে বলে, অই তো ছুরি, শান, রক্ত, অচেনা মেয়েটার পোড়া শরীরটা ঢেকে দিতে আসছে সেই শুশ্রুষা ফুটন্ত অ্যালুমিনিয়াম যার কিছু ঠিকরে ওঠা কণা কালো ঠান্ডা আকাশে গিয়ে চকচক করছে আজ অনন্তকাল।

এখন মহাজাগতিক শীতলতায় তাদের ওপর বরফ পড়ে, ন্যাড়া খাদের পাড়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে সারা গায়ে কাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নগ্ন নারী, পুরুষ। আহ অই পড়ে থাকা পাথরগুলো যদি একবার বলে উঠতে পারতো তাদের নিজস্বতা,

একঝলক ডুবে যেতে তোমরা, আমার চিৎকারগুলো থেকে গভীর দূরত্বে

কলকাতা-সোরিয়া ২০০৮

নিঃসঙ্গতা বিষয়ে

অনেক কিছুই বলা যেতে পারত আপাতত শুধু আদিগন্ত বিস্তৃত পাথরের স্তূপে সামান্য বরফ ধরেছে, তার ফাঁক দিয়ে কাজলের দাগের মত দূরের পথ, সেখানে একটা লোক, সঙ্গে একটা কুকুর, লোকটা নৈঃশব্দ্য, কেবল কুকুরটাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ফালাফালা করছে তার থাবায়

সোরিয়া, ২০০৮

সুখ আকার স্তব্ধতা

তারপর পাথুরে জমি মাখতে মাখতে দুরূহ স্পর্শের কাছে উপনীত হলাম। শামুকের থেঁতলে যাওয়া খোলের গন্ধ, অবরুদ্ধ ধানখেতে পতাকার গন্ধ, দীর্ঘ মালভূমি উপত্যকায় গম খেতের লালচে গন্ধ একাকার হয়ে পথ করছে ভিজে ফেরারি রাস্তাটায়।

স্পর্শে শ্রাবণ মাসের দুপুর, আর তীক্ষ্ণ অন্ধকার, ধূসর কুকুরের পালানোয় মিশিয়ে দিতে দিতে কেটে গেছে কত যে দিন। আকাশের নরম দেহ, তাকে ছোঁয়া ইউক্যালিপ্টাসের পাশ দিয়ে বয়ে আসা ইশকুলের ঘন্টা, বিকেল ৩ টের অবয়বহীনতা নখ দিয়ে ক্রমাগত ছিন্ন করে দিয়ে কতবার যে সে একা একা ডেকে গেছে দুপুরের ফেরিওলার মত ; আজ সেই খনন পুনর্বার...

রাস্তায় বিচ্ছিন্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘুম ঘুম কয়েকটা আকার যাদের বাড়ি বলে ডাকলেই যেন খুলে যাবে সবকটা দরজা। সদ্য চেরা কাঠের হলুদ দুপুরের মেঘের ফাঁক থেকে ঝরে পড়ছে তাদের ওপর। আমি স্পর্শ করলাম।
আস্তে আস্তে মথিত হতে লাগল সুখ, আকার, স্তব্ধতা। কখন যে আমরা পরস্পরের দেহে আঁচড় কাটতে শুরু করেছি ; পাগল অংক স্যারের ব্ল্যাকবোর্ডে চকের গমনের মত... বারবার ভেঙে যাচ্ছে চক এবং তার গন্ধ ব্যাপিত হচ্ছে সামনে বসা ছেলেটার মস্তিস্কে... আর কালো বিস্তৃত সন্ধেমাখা দুপুরের শরীরে স্তব্ধ নাভিমূল, মগ্ন লুব্ধকের মত,

তার সামনে প্রশ্রয় চাওয়ার ভঙ্গিমায় দেহ ঝাঁকাচ্ছে রাস্তা কালিক্সতো পেরেদা, যার ওপর সওয়ার একটাই ইশকুল ফেরত কিশোর ; বাকি সবটা ঢেকে দিয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টির হাওয়া

বারুইপুর, সোরিয়া ২০০৮

বিশ্বাসী মানুষের কথোপকথন

রোগা, মনখারাপের রুমাল পকেটে নিয়ে চলা মানুষদের সঙ্গে দেখা যায় ঈশ্বরের কথোপকথন হয় চোখের তলায় জমে থাকা কালিতে, সোনালি পাথরের গির্জা থেকে বাইরে বেরোলে সে দেখতে পায় ধীর একটা মেঘলা বেড়াল গির্জার প্রাচীন অব্যবহৃত অংশের ওপর থেকে তাকে লক্ষ্য করছে

বিশ্বাসী মানুষের সময় পায়ের কাছে সর্বক্ষণ পাক খায় , কালো গানের পলকা মানুষরা, আমরা, টের পাইনা তরতাজা গ্রীষ্মের পরিপার্শ্ব, কাঠবেড়ালি, অ্যালুমিনিয়াম রোদ্দুরের চামড়ায় আলতো হাত বোলাচ্ছেন ঠাকুমা দাদুরা- পুরনো অভ্যেসের পাশে নাতি নাতনিরা

তারপর সেই রোগা লোকটার এলোমেলো হাতের তালু থেকে গড়িয়ে নামে বয়ঃসন্ধির রাস্তা, ওই তো জন্মের আতর লুকিয়ে রয়েছে, সামনে নামা রোব্বারের উপত্যকা: পাইন মেপলের আলামেদা পার্ক— অনেক মানুষের সমাগমে, খননে পাওয়া প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের ভেঙে যাওয়া পাতার মত আস্তে আস্তে নমনীয় হচ্ছে সকাল

অক্ষর মানুষের সব অনুভূতি ধরে রাখতে পারে না, ধ্বনির বিমূর্ততার কথা ভাবলে অনেক সময় বোবা হয়ে যেতে হয়, তাহলে এইসব ছোট উড়ানের দৃশ্যগুলো কোথায় যায়? অন্তত কি সামান্য দীর্ঘশ্বাস/অশ্রু হয়েও ভাষার দেয়ালে ফুটো করে দিতে পারে? ভাষার ফ্রেস্কোয়? বহু পরে গির্জার দেয়ালের নষ্ট ছবি উদ্ধার করতে এসে শিল্পীরা যাকে নুনের ছাপ বলে চিহ্নিত করবেন...

সোরিয়া, ২০০৮

লণ্ঠনের দোজখ

বুকের ভেতর দাঁড়িয়ে উঠেছিলো রাতের পাহাড়ি রাস্তার বাসের আচমকা হেডলাইট যেন এবার চুরমার করে দেবে শ্যাওলা পড়া দরদালান জাঁকিয়ে বসা শীতকাল আমাদের দোজখের জানলায় আর কবে এসে বসেছিলো পায়রা নিজস্ব লণ্ঠনের আলোয় ঝকঝক করে উঠেছিলো পোকাগুলো, আমরা তো ছোটো ডানাতেই ভর করে উড়তে শিখেছি, ছোটো ছোটো উড়ান, আমাদের দীর্ঘাঙ্গী মেয়েরা কথা বলে গেছে নীচু স্বরে, অজানা স্তোত্র, ভাঙা অনুয়, মাথা মুণ্ডুহীন যতি চিহ্ন, আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মহাকাশ শীতল কোনও কোনও বই, তারপর আমরা তো ছোট ছোট উড়ান ভরতেই অভ্যস্ত হাঃ ছোট নিঃশ্বাস আমাদের, ওই তো শীতের দুপুর তিনটে নাগাদ জানলা দিয়ে যে হলুদ জিভটা ঢুকে এলো বিছানায় তার গায়ে মেলে দিচ্ছি চামড়া, টানটান হয়ে উঠবে, সবে তো ৩টে বাজে চলো একটু ঘুরে আসি, সন্ধের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের নিরীশ্বর থাকতে পারার খরচাপাতি, মানপত্র

আরও একটু দূরে একটা মেয়ে একা একটা গাঢ় কালচে এলম গাছের কাণ্ডে হাত বোলাতে বোলাতে আবিষ্কার করে ফেলবে একঝাঁক মৃত সাদা মথ, তার পাশে একটা ছুরি গিঁথে আছে

রাবাংলা, সিকিম ২০০৫-সোরিয়া ২০০৮

স্তব্ধতা মানে নিজের ভেতরে অলক্ষ্যে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা শীতকাল। একটানা বেজে চলেছে যেসব শিশুকান্না, তাদের ইতিহাস থেকে উত্তাপ বিকিরণ নিয়ে চলো হে এবার অই উঁচু দুনিয়ায় চলে যাই। এই তো তোমাদের ঝকঝকে ভূগোল। এই তো আমার ভেতরে শুরু হয়ে গেলো একটানা সাদা ফুলের বরফে ঝলসে ওঠা ঠুম্‌রি। আমিও কি তোমার মত সম্মোহনে চলে যাবো ওই দেশে? ওই উঁচু দেশে দূর থেকে দেখবো তোমাদের বাড়ি সুঠাম কুকুরের মত লড়ছে তোমাদের মাথার ওপর যাবতীয় দুর্যোগের সঙ্গে।

আমরা নীচু হব। অনেকক্ষণ বাদে যখন চাঁদ কমলা হয়ে বাদুড় দ্যাখার আয়নাতে পরিণত, আমাদের কান ছুঁয়ে আছে এই পরদেশি শরত। আচমকা এলো পায়ের রক্ত স্পর্শ করেছে পাহাড়ি উপত্যকার ঢালে কেটে নেওয়া গমের গোড়া । হিম, হিমেল, শিশির, বাষ্প এইসব শব্দ নিয়ে ঘাঁটুক তোমাদের বাচ্চারা । আয় তুই আমি ঠান্ডা, ঠান্ডা, ঘাড়ে ঠোঁটে উপচে উঠছে ঠান্ডা, মাঠের নিজস্ব অণুজগতে ঢুকে যাচ্ছে আমাদের নৈঃশব্দ্য, আমাদের নিঃশ্বাসও কি মিশে থাকছে ভাবতে ভাবতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকছি আমরা, মাথার উপরে কেউ জরির কাজ করা কালো সিল্কের রুমালটা মেলে দিলো,

আমরা দুজন চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে হাত পা ছুঁড়ছি, - কিন্তু তুই কে? সেই কুৎসিত ফ্যাকাশে লোকটা, যে সস্তা হিন্দি সিনেমা দেখে কেঁদে ফেলে? যন্ত্রণাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যায় হুউউই মাথায়। কলকাতার শীত সন্ধের আঁচ । আর ক্রমশ আরও ঝাপসা হতে থাকে ভাতের গন্ধ, ফ্যানের গন্ধ, ওই তো সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত রক্তের দাগ নখের দাগ অশ্রুরেখা বরাবর বাসা বেঁধেছে একটা প্রাগৈতিহাসিক পায়ে চলা পথ, এই যে ঠায় সে দাঁড়িয়ে আছে এই মাঠে গজ কাপড় কুয়াশা ঢেকে দিচ্ছে

তার দাগগুলো, এতে কি তার আরাম হচ্ছে? আহ ঠান্ডা, ঠান্ডা তুমি কোন পথে এলে পথিক, উত্তেজিত স্নায়ুদের অবাধ্য কুকুরগুলো নমনীয় হয়ে তাদের সামনের পা টানটান করে তোমার সেই দেশেরই তরে যাবতীয় মনকেমন উড়িয়ে দিচ্ছে,

আহ পাথরগুলো

সোরিয়া-প্যারেং , ২০০৮-০৯

নষ্ট হয়ে যেতে যেতে

আমি আবার দাঁড়াই সেই লব্ধ পাথুরে জমিতে এসে। খুব কাছ থেকে দেখলে নজরে আসছে শরীরের ফুটিফাটাগুলো, যে ছাই লেগেছিলো ক্ষতের ওপর, এখন হাওয়ায় তা এলোমেলো হয়ে গেছে। এ কোথায় দাড়িয়েছো তুমি বলতে বলতে কেউ বুঝি সরে গেলো পাশে। সকাল হচ্ছে, বিকেল ঘাপটি মেরে লক্ষ্য করছে সকলের বাড়ি ফেরা, তীক্ষ্ম হয়ে উঠছে কেমন সব কাঁটা,

তুমি ক্রমাগত ক্ষয়ে যেতে যেতে, ছোট হয়ে যেতে যেতে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছো ওই তো ওই ন্যাড়া গাছটার দিকে, বৃষ্টি শেষে কমলা হয়ে থাকা আকাশ ও ভেপার ল্যাম্পের ঘোরে জেগে থাকা পাখিটার দিকে, এই মাত্র মাথার ভেতরে উশকে উঠলো একঝলক লিরিক নাকি?

পুড়ে যেতে থাকে মাথার চুল, চামড়া পোড়া গন্ধের নীচে যুদ্ধ শুরু হয়, চিৎ হয়ে উপুড় হয়ে পাশ ফিরে, সরু হয়ে আসা হাতটার সঙ্গে পিয়ানোর, সুরের সঙ্গে ছোট হয়ে আসা মাথাটার, শব্দের সঙ্গে পাথর মস্তিস্কের। আহ আর হয় না, নষ্ট হয়ে যেতে যেতে চিৎকার করতে চাইছি, অসহায় দেখে যাচ্ছি যে সব শব্দকে জাদু স্পর্ধায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম এই পৃথিবীর কমলায়, হায়, তারা আমাকেই ভগ্ন, নুব্জ, ফেলে রেখে গেছে শেষ ছাই ভাসানোর নদীর পাশে, এই নরম ঠান্ডা তীরে। আমার শরীর ঘিরে উড়ছে অজস্র সাদা পাতা

সোরিয়া ২০০৮

একটি দুরূহ কবিতা

কোথায় লুকিয়েছিলো এই খুব সাদা হয়ে আসা আলোটা? যতবার এড়িয়ে থাকতে চেয়েছি একে, ততবারই আমি যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়াই। বলিঃ এই উদাসী হাওয়ার ফাঁকে যে সমস্ত মুক বধির ছেলেমেয়েরা বাসা করেছে তাদের গায়ে কি কোথাও কবিতা আছে? না। কবিতার ভেতরের ঘরবাড়ি ফাঁকা হয়ে আসে। পুরনো দালানে, ঘুলঘুলিতে যে স্তব্ধতা জমে আছে তা আসলে সাদা ।

আর তোমার মৃত্যু?

রঙের ভেতর দিয়ে জিভে এসে জড়িয়ে গেলো যে ভাষা, সেটাই কি তোমার ভাষা, বিষাদের মগ্নতায়, নিবিড়তায় পায়ের কাছে লাফিয়ে উঠেছে ছুটি।

এইসব রাতগুলোয় শব্দদের গায়ে মাংস লাগে। ঠাণ্ডা বাতাস উশকে দ্যায় উদ্‌যাপন। গুনিনের বশ থেকে শব্দদের ছাড়িয়ে আনতে কেউ কেউ যুদ্ধে গিয়েছিলো, এখনও তাদের তাঁবুর চিহ্ন দ্যাখা যায়। ঋতুর কৃপায় মেয়েদের স্বাভাবিক বুক আরও স্ফীত। আরও মোহ। যেন এক্ষুনি ছুঁয়ে দিলে শিহরন জেগে উঠবে স্তনবৃন্ত বরাবর। কাদা মাখতে শুরু করে উঁচু বুকের মেয়েরা। আগুন জ্বালানো হবে, সংগ্রহ করা হবে পড়ে থাকা কাঠ। শিরশির করছে দাঁত, আদিম শরীর বেয়ে চোখ চলছে। ঘাম। ওই তো একটা কাদামাখা মেয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরছে তার উচ্ছাস। জ্যান্ত পাইনগুঁড়ি। তার ভারি বুক, জমাট বোঁটা ঘসটে যাচ্ছে কাঠে, লাইকেনে

তার মাথায় ওপর উজ্জ্বল হচ্ছে লালচে বিকেল, দাঁড়িয়ে উঠেছে সার সার তাঁবু। কবে, কোথায় দেশ ছিলো? আমাদের কষ্টগুলো হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থাকে। ভ্যাপসা একটা ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবার আগে কেউ কেউ প্রশ্ন

করবে ভেবে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। কিন্তু পারেনা। হায়, হলুদ হয়ে এসেছে পাতাগুলো, নীচের মাটি। বহুদিন হাড় মাংস বহন করে করে কালচে হয়ে উঠেছে চোখের কোল, যুদ্ধনিখোঁজের বউএর

সোরিয়া ২০০৮

অপার হয়ে বসে থাকা কবিতাটা

যেকোনও মানুষের মত তারও গলা ভেঙে আসে, প্রতিরোধের যাবতীয় ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলে তার দেবদারু জামাটার নীচে অগুরু মাখাই আমরা, আতর, গন্ধ, জ্বর, বমি, কান্না, বলি মাংস পিণ্ড, যাও, আর আঁচড় খেওনা,

মনে পড়ছে যাবতীয় সঙ্গে কাটানো সময় আর ভিক্ষে চাওয়ার সময়কার ঝুলে থাকা মুখটা, কুকুরের অপমান সহ্য করতে পারার ক্ষমতা নিয়ে চলে যাওয়ার সময় পড়ছি একটা পুরনো লেখা: কে ঠকায়, গ্রহ? আয়ু? না বাসনা?

শুরু হয়ে যায় তোর সঙ্গে কৈশোরক হেসে উঠতে চাওয়া, আমরা মজে যাই মাংসের উৎসবে, সারে সারে সাজানো মাংসের স্তূপে হাত দিই, টিপি, চুসি, কামড়াই তারপর সারা শরীরজুড়ে পাথুরে হাওয়া দ্যায়, হায় আমাদের কোনও পূর্বসূরী নেই! শুধু এই খোলা হাওয়া লাল টলটলে মায়া বস্ত্র আমাদের নির্মাণ করে নেওয়া বিজ্ঞান যাবতীয় শাস্ত্র এবং দফায় দফায় ধার দেওয়া ছুরি, তৈরি হতে থাকে সেই চিরসত্যের রাজত্ব! এ কি সত্য সকলি সত্য বলতে বলে সরে যায় পরিচিত পুরুত, আহা সত্যের জন্যই তো এই পৃথিবী নামক নারী জমি ইত্যাদি নানা রকমের এতদিন চলে আসা বিনিময়মুদ্রা টানটান প্রস্তুত হয়ে আছে,

পরমের গন্ধ পেয়ে ভঙ্গুর হয়ে থাকা মেপল গাছের গায়ে হাত রাখতে যায়, পোষা কুকুরের মত, আমার এই অপার হয়ে বসে থাকা কবিতাটা

বালকবীরের মত দুএকটা গথিক তুহিনশিখা ঠিকরে উঠছে ওপরে, আর নামিয়ে আনছে দুয়েক টুকরো পুড়ে যাওয়া শুকনো পাতা

কলকাতা-সোরিয়া, ২০০৮

একটি নিষ্ঠুর কবিতা

মেঘের দিনের পাশে পড়ে আছে ব্যাক্তিগত আলোয়ান তার পাশে ছোট শহরে ঢোকার রাস্তা – হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে, ঘন কালচে গুঁড়িওলা জঙ্গল শ্যাওলা শ্যাওলা কেটে রাখা মৃত গাছশরীরের ওপর সবুজ নরম আর কোথা দিয়ে যেন এসে গেছে লিরিক কবির প্রিয় ছোট্ট নদীটির একটি পিকচার পোস্টকার্ড সূর্যাস্ত আর গোটা চোখের সামনে দাউ দাউ করছে সবুজ। এরকম দৃশ্যের ভেতরে বিলিতি ছায়াছবিতে একটি বালক থাকে। তার পাশে খুন হয় কেউ গাছের আড়ালে, গুলির শব্দ পাওয়া না গেলেও সবুজের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া রক্তটা গরম

আর আমার তোমার কথা মনে পড়ে ফাঁকা হয়ে আসা মেঘলা মাঠটার দিকে চেয়ে তুমি বলে উঠতে এই নিস্নচাপ যে তৈরি হল, এবছর ধান বড়ো ভালো, আর তোমার শুকনো গলার হাড়গুলো চিরে বেরিয়ে আসতো অদ্ভুত হাওয়া যে কথা তুমি বলতে না – আর কোনওদিন ধান হবে না, প্রতিদিন আমরা কেমন যেন বেশি করে রুখু! কোথায় যায় এই সব সবসময় লাল হয়ে থাকা ঊর্ধ্বমুখি মানুষগুলো?

স্মৃতির ভেতরে কোনও শুদ্ধ আলো বা ছায়া পাইনা আমরা, কেবলই একটা সুর তৈরি হতে থাকে আর আমরা তাকে চাটতে থাকি – পশুমাতা সামনে থাকা সন্তানকে যেমন – তবু কিছুতেই জোর দিয়ে লিখে রাখতে, বলে যেতে পারিনা তোমায় ছাড়া সব কেমন শূন্য লাগে – সামনে একটানা ধূসর ভূদৃশ্যে এই যে কিশোর একা হেঁটে চলেছে, পাশে বরফ নাকি অন্য কোনও সাদা তাকে ঘিরে আছে বোঝা যাচ্ছে না, আরেকটু গেলেই সামনে একটা সমবয়সী মেয়ে তার সামনে পিকনিকের মাদুরের মত বিছিয়ে দেবে একটা মে মাসের দুপুর। এই ঝড় উঠলো উঠলো বলে, তুই

কি সাইকেল চালাতে পারিস? – *দ্যাখো কেমন বরফ জমে যাচ্ছে জানলায়, কাঁচ নেই আমার শীত করে এখানে খুব মারে এরা আমার শীর্ণ নীল আঙুলে তাও তোমায় লেখার চেষ্টা করি, পৌঁছয় তোমার কাছে আমার কবিতাগুলো নাদিয়েজদা, কণ্ঠস্থ রেখো তুমি, তোমার মৃত্যুর আগে যদি এই পাথর না ভাঙে তাহলে, দ্যাখো না খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে বারবার, দ্যাখো না...*

আর শোনা যায় না, কোনও কোনও স্বৈরাচারীর নামে আজও রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে আর সেইসব আটকে পড়া ছোটো আর্তনাদগুলো কোথাও গিয়ে বড় প্রতিধ্বনি তৈরি করতে পারে না, তাই বলে কি তাদের জন্য জেলখানায় জন্মদিনের উপহার যায় না? বারবার ফিরে আসে প্রাপক মৃত বলে, আর আমাদের দেশ ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়...

ট্যাবলেট আর বশিকরণ কলম নিয়ে বসে পড়ি, আস্তে আস্তে লিখে ফেলি দেশ, তার শিরায় শিরায় ঢুকে থাকা আমাদের অভিযান, সে সবই মিথ্যে, জিভের ডগায় আটকে নিয়েছি পুরনো অক্ষরগুলো, ভীষণ গোপন বিষ, ধরা তো পড়বই! শহর ফাঁকা হয়ে আসছে একটা লোক একা বসে নৈঃশব্দ্যের পাশে।

একটানা বিষাদ আমাদের দরজার গায়ে কিছু নুন ফেলে রেখে যায়, কমিউনিস্ট বাড়ির দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়েদের লুকোনো লিপস্টিকের মত, আর সেইসব জানলার পাশে একটা ঠাণ্ডা প্রায় বুজিয়ে ফেলা আসা পুকুর থাকে, গরম শেষের হাওয়া, থকথকে ব্যাঙের ডিম, শ্যাওলার গন্ধের ওপরে হলুদ ভেপার ল্যাম্পের আলো খেলিয়ে গেলে, আমি অনুপস্থিতি নিয়ে তার পাড়ে বসি: পুরনো কবির আত্মহত্যার গল্প মিশিয়ে দিতে থাকি পুকুরটার খুন হওয়ার ঠিক আগেকার থকথকে জলে

কলকাতা-সোরিয়া, ২০০৮

ভায়োলেন্স গুচ্ছস্বপ্ন

গ্রামপতনের শব্দ হয়

হেরে যাওয়া যেকোনও অঞ্চলের পোষা খয়েরি বাতাস এখানে, এই নুমানসিয়া নামক ছোট্ট প্রাক-রোমান স্পেনীয় গ্রামে এখন মিশে আছে। 'রোমান' শব্দটির অর্থএখানে মাছের আঁশের ভেতর দিয়ে দ্যাখা একধরণের আলো যার নীচে দীর্ঘ যুদ্ধ চলে। আজ এতদিন পরে সাধারণ বেড়ানোর মধ্যেও আমাদের ভেতর অনিবার্য পতনের গন্ধ খেলা করে। সেই অতিদূর সময়ে যখন গোটা গ্রাম আত্মহত্যায়ঃ

২৪ শে ডিসেম্বর

একঝলক কালো শিরা, তার ওপর সাদা ছোপ, জোরালো আলোতে চোখ বোজালে যেমন হয়, শিরাগুলোয় কিছু পুরনো মানুষ সাদা অংশে প্রাচীন সৈন্যদের পায়ের চাপে খেলিয়ে যাচ্ছে বরফ, কিছুটা দূরে ন্যাড়া টিলাপাহাড়ের ঝাঁক বেড় করে সাদাকালো অতিকায় ডানাঃ নামহীন নদী , এলাকায় পড়ে পাথুরে উনুন, পাড়া, খামার, এলোমেলো শূন্য পার্ক, বিষের পাত্র, গোত্রহীন শহর, জিন্স, স্কার্ট, একটা পুরনো বই মলাটে লেখা *জিপসি ব্যালাড*

২৬ শে ডিসেম্বর

একটা রাস্তা খোলাঃ ভারি জলপাই রঙের পোশাক বুলেট সাঁজোয়া লুঠ ইত্যাদি পরিচিত শব্দগুচ্ছের আগে আমরা দৃশ্যের জন্ম দেবো, শিভ্যালরিবাতাসের রং মার্চমাস, তারপর বুদ্‌বুদ শহর, সিগন্যালপোস্টে বেলুন বাঁধছে কলকাতার ভিখারি বালিকা, দূরে দ্যাখা যাচ্ছে একটা প্রায় ফাঁকা পাহাড়ি গ্রাম, পপলার গাছগুলো জড়িয়ে ধরছে কিছু নগ্ন কুমারী মেয়ে, স্তনবৃন্তে মাখানো রয়েছে বিষ, বিভাজিকা পরবে ঝুলে ধারালো বিদ্যুৎ!

কলকাতা, ২০০৯

বিশ্বাসী মানুষের খাতা থেকে

পরিচয়হীনতার ভয় লাগে, ঘুম রঙের সন্ধের তলায় তীব্র বাঁক নেওয়া পাহাড়ি রাস্তা, সদ্য পড়া সবুজ পাতাটার জেদি শীতলতায় ঠিকরে উঠে বাইরে বেরিয়েছিঃ পরিত্যক্ত রেলব্রিজ, নীচে গেঁজে ওঠা নৈঃশব্দ্য বাকিটা গিলে নিয়েছে

না না লেখায় ঘুরে হেরো লেখক এসে দাঁড়িয়েছে নষ্ট কোনও পুরনো উপমার সামনে – আর কেউ নেই আজ! সমস্ত অক্ষর ভেঙে দীর্ঘ বাষ্পগ্রীবা হয়েছে, সামনে ছড়িয়ে আছে পুরনো ট্রেন দুর্ঘটনার চিহ্নের মত ইতস্তত শব্দ ; তাদের কোনও কোনও জানলার ফাঁকে তখনো ঝুলে রয়েছে কারও ওয়াটার বোতল, শিশুর মার কাছে ফিরে আসার সরলতায় সেই লেখক পেছন থেকে শাড়ি ধরে টানে তার আদি শিল্পের, সামনে তখন রান্না হচ্ছে – চোখ তুললে দীর্ঘ খোলা জানলা

বাইরে ভিজে পাতা পড়ে পড়ে ভরে আছে জাঙাল উঠোন, একটা শুকনো নদীখাত – ইওরোপীয় রূপকথায় যেমন থাকে – তার ওপর খেলনা একটা সেতু, অর্ধেক ভাঙা, তার মুখ দিয়ে যে পথের আভাস, সেখানে পাঁউরুটির বদলে ছড়ানো রয়েছে টুকরো টুকরো কবিতার পাতা

ফিরবি?

সোরিয়া, ২০০৮

চিতাবাঘ শহর
রচনাঃ সোরিয়া, এস্পানিয়া ২০০৮

১

উপত্যকাময় ছিলো আমাদের গোধূলি -

কাচের কবিতা নিয়ে একটানা বৃষ্টিতে হাঁটছিলাম,
আর সেই কবে পড়ে গেছি আমি প্রাচীন ভাস্করের অন্তরগর্তে
বেড়িয়ে ফিরে দেখছেন মৃত সন্তান প্রসব করেছে সঙ্গিনী
রক্তে ভেসে যাচ্ছে ধাতব যোনি,
আমার কানে বলেনঃ প্রাচীন মানুষেরা যখন
একটা মাথা, একটা পুরুষ বা নারীতে অভ্যস্ত নয়,
তখন তারা আবিষ্কার করে ফেলেছিলো উনুন
আর খাবারে ঢুকে পড়লো ধূসরিমা,
তারপর থেকে লিরিকের দেহে চোরাগোপ্তা ব্লেড
আস্তানা বদল আক্রমণ প্রতিরক্ষা, জমি সন্তান বীজ,
আর কিছুদিন বাদে গ্রাম পালানো নতুন ভূখণ্ড,

প্রথম সমুদ্র দেখার পর আদিম মানুষ কী ভেবেছিলো?
একটাও মানচিত্র যখন তৈরি হয় নি?
রোমানিয়া থেকে আসা আকোর্দিওন বাদকের অন্ধকারে
সুর হয়ে যাচ্ছে গোটা চৌরাস্তা,
গ্রীষ্মে উজ্জ্বল মেয়েদের হাঁটু,

এইসব দৃশ্য থেকে টুকরো কেটে নিয়ে
গর্ভের মধ্যে জাগিয়ে রাখা রোদ পোহানো সমেত
গোটা শহর এখন একটা মহাকাশযান

মুখে শিকার ঝুলিয়ে ধীর চিতা কোথায় চলেছে?

২

জানলায় ঝলমলে চিতাবাঘ শহর
নমনীয়তায় ব্যকরণে অর্থবহ হয়ে উঠছে ক্রমশ
এইসব ক্রোমিয়াম লেখমালা: বহুতল, ট্র্যাফিক সিগন্যাল
একদিন পড়ে ফেলা যাবে ভেবে পাথুরে দেয়ালে
স্যাঁতসেঁতে ছবি করে খোদাই করছি সবকিছু
নীলচে জল, সন্ন্যাসিনীদের মঠ
অগ্রজ কবি ও তাঁর অসুস্থ সঙ্গিনীকে নিয়ে
কাটানো টিউবারবিকেল

বাতাস ফাটায় দুপুরের হলুদ
প্রতিটা ক্রসিং এ, প্রতিটা মেঘের ফাঁকের স্তব্ধতায়
গোঁজা রয়েছে হঠাৎ চলে যাওয়া মোটর সাইকেলের
আওয়াজ, ফুটপাথে পাতার শুকনো স্তূপে পরিত্যক্ত বিয়ারের ক্যান

হাওয়া দেওয়ার আগে সমস্ত দৃশ্যগুলোকে তুলে রাখতে হবে
একতলার হলে অর্কেস্ট্রার দল, রেওয়াজ,
সকালে দেখেছি শূন্য চেলোটার ওপর
একটা বাচ্চা চড়াইকে খাওয়াচ্ছে মা
পিছনের জানলা দিয়ে হলুদ ডাকবাক্স

ডাকবাক্সের তৃতীয় নয়ন

৩

ছোট্ট নৌকায় চেপে আফ্রিকা থেকে ইওরোপ আসতে গিয়ে যে ১২ জনকে
মৃত পাওয়া গেলো কানারিয়া দ্বীপে, তাদের

শহরের প্রাচীন অঞ্চল আসলে বৃদ্ধ মানুষের মস্তিষ্ক
ক্রমশ প্যাঁচানো দেশ, জাতীয়তা, গলি
নাদির শাহের পাশে জ্বলছে শাহি দিল্লি
সান্তো দোমিঙ্গো গির্জা
— দূর ক্যারিবিয়ানে তখনো পৌঁছয়নি স্পেনীয় জাহাজ
সামনে দিয়ে আসছে বাজার, গৃহযুদ্ধ ফেরত গুয়াতেমালার মেয়েটা

এরপর নিজেদের দিকে তাকাই
রুক্ষ চিন্তারেখা বরাবর গজিয়েছে সাইপ্রেস
রুগ্ন বালকের পাশে উজ্জ্বল নার্স গ্রীষ্মকাল

খুলে রাখছি কবিতার শেষ দরজাগুলো
আমি, আমরা, ভয়, ছেঁড়া ফাটা ভেলার মত নৌকা
তাতে ভেসে আসা জ্যান্ত দেশ পারাপার, মৃতদেহ,
সমস্ত অক্ষরগুলো লোহিত তপ্ত হয়ে উঠছে
স্তব্ধতার পেটের ওপর নেমে আসছে ছাইবৃষ্টি
পাইনের পাশে লকলকে রাত্তির, মদ ও বাগান

আমাদের কাঁটাওলা ম্যাপবইয়ের কোথায় যায়?

৪

একটানা ভারি গাড়ি চলার শব্দ
অনেকটা দূর থেকে পরিষ্কার বাতাস হেতু
কানে শিশুদের যুবক যুবতিদের গলা
বিচ্ছিন্নঃ সমুদ্রের তীরবর্তি হোটেলের বারান্দায় যেমন
আস্তে আস্তে ফেনা, সিগারেটের প্যাকেট
কিন্তু বাতাস শাসন করছে শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর
আঙুরের জন্ম হচ্ছে
বাক্যের মৃত্যু – ছেদ চিহ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো ভেসে
অথচ আমাদের স্যানাটোরিয়ামের স্বপ্ন ছিলো উদাত্ত পপলার বনে
কবি, মৃত্যু, হাঁটুতে মুখ গুঁজে থাকা লাইনের স্তূপ

সামনে দিয়ে পাশ দিয়ে
জাদুঘর, বিরক্তিকর সঙ্গ সমেত
লেখাটার মাঝখান চিরে চলে গেছে নিকোলাস রাবাল মার্গ

সালংকারা নিভৃত প্যাগান

৫

তারপর পাশে খুলে যায় হ্রস্ব বিকেলের গুহার মুখের মত
স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা ধরা সময়
নীচু হয়েছে আকাশ এই বুঝি তুলোর ইশারা নামবে
ঠোঁটে বুকে জিভে লাল উন্মুক্ত নদী
– পাথরের ধূসর পৃথিবী একবেলা মুক্ত রাখো
আরও কাছে ডেকে উঠবে টুনটুনির সবুজ উত্তাপ – বলে সরে যাস তুই।
তোর লালা ঠোঁটে বুকে জিভে জড়িয়ে
উঠে আসছে নীলাভ সংকেত
আঙুলে নখে শিরায় রোমকূপে
ফুটে উঠছে স্টিলের কুসুম
ধারালো গন্ধে বশ করে করে ফেলা যাবে ভেবে ছড়িয়েছি মোহবীজ
শান্ত জানলাটার বাইরে অক্টোবরগাছ
মসৃণ চামড়ার গায়ে পুষে রাখা জীবাশ্ম হলুদ

৬

না লিখতে পারা পাতাগুলোর গায়ে ফুটেছে যে মেঘলা
তার শরীরে মিশিয়ে দিই ভিজে ভিজে আলামেদা পার্ক
সন্ধের মুখে কোইয়াদো চৌরাস্তার আলোকময়তার বুকে বিঁধে আছে
যে ছোট্ট গলিটা তার সঙ্গে মিশে যাই নিজেঃ
অন্ধকারে আমাদের যন্ত্রণার নুনগুলো
আরও বেশি ফসফরাস সংগ্রহ করেছে

সামান্য বৃষ্টির আঁচে কেঁপে গেছে চলাচল
চার্চ ফেরত বার্ধক্যের সামনে কমা,
কাফেতেরিয়ার গায়ে সেমিকোলন
লক্ষ্য রাখছে আমাদের ছড়িয়ে দেওয়া নিশ্বাস
আর সদ্য পড়া তুহিনের কাচে হাত ফুলহীন কিশোরী
পরনে বিশ শতকের গোড়ার পশ্চিমী পোশাক
ক্রিমসন রঙের স্বপ্নবিজ্ঞান

ভাষার দেহে পাতা ঝরাচ্ছে পপলার
ঠাকুমাদের মুখ থেকে দীর্ঘ জলাশয়ের মত শান্ত গল্পগুলো
কেউ কি শুনছে?

৭

মাথা তুললেই আবার গির্জা, প্রকাশ্য ক্রুশটার পাশে কাঠি জমিয়েছে পাখিরা।

ধ্বংসস্তূপ একজন পুরুষ খাদের পাশে দাঁড়ায়।
চলে যায় সাতশো বছরের গির্জার ঘন্টাধ্বনি, ভারি চাকায় ঠিকরে ওঠা পাথর।
একঝলক নতুন সবুজ ভরে রেখেছে পাহাড়সমূহ।
ফাঁকা মাথা নীচু করলেই ফিরে আসছে যন্ত্রণার জঙ্গম মসৃণ রাস্তাগুলো,
ঠিকরে উঠছে না পাথর, গাছপালাগুলোকে আরও রঙিন দ্যাখা যেতে পারে,
পাশে শাড়ি পরা মেরি
সদ্য ঋতুমতি হয়ে পাদ্রির কাছে এসেছে পরীক্ষার ফুল নিতে।
মাথা তুললেই আবার রাস্তা আর একা একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে,
তার ক্ষুরের শব্দ নেই
আরেকটু দূরের বিস্তৃত তৃণভূমিতে
আরও একটা লালচে ঘোড়া নিঃশব্দে ডিগবাজি খেয়ে নিল।
মাথার ওপরে নিয়মমাফিক রং বদলে যাচ্ছে
যেভাবে বইয়ের তাকে কোনও কোনও বেয়াড়া বই বার বার পড়ে যায়।

যাদের হাতে সময় একটু বেশিক্ষণ দাঁড়ায়,
তাদের বুকের পাশে গিয়ে জমা হতে থাকে এইসব ছবি,
যেখানে পুরনো কালির পেনের নীলচে ছোপ বুক পকেটে।

অনেক নীচ থেকে অই পাহাড়ের ওপরে
যন্ত্রণা আর বিকেল নিয়ে দ্বিধান্বিত লোকটাকে
একটা ছোট্ট কাঠের মত দ্যাখে তারা,
চাঁদের নীচে এই বুঝি নিভৃত দোয়েল তাকে তুলে নেবে,
যত্ন করে রেখে দেবে খুব পুরনো ক্যাথিড্রালের প্রকাশ্য ক্রুশের ফাঁকে,
বাসা তৈরির কাজে, গ্রীষ্মের সঞ্চয়ে

৮

ক্ষতমুখ খুলে গেছে
ছায়ার ভেতর থেকে নিস্তব্ধ শরীর টেনে লাল হয়ে
জেগে আছে পরদেশি ঋতু
গায়ে কুয়াশার রোঁয়া দেখে বুঝতে চাইছি চুল্লি কতদূর

ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে লেখাগুলো
গালে আঁচড় কাটলে তবে প্রাণ সংকেত
কে পড়বে এইসব?
যতদূর চোখ যাচ্ছে দীর্ঘ উপত্যকার ঢালে পড়ে
অক্ষরবিহীন কিছু ছেদ যতি চিহ্ন, নীলচে ভাষার কঙ্কাল

পিছনে তাকিয়েছি ভয়ে, অবশিষ্ট শিবিরের দিকে
আগুন, খাদ্য প্রস্তুতির সামনে নাচ
তাহলে কি এই পোড়া ভোরে খয়েরি বুলিয়ে দেবে শালিক, বলো?
আমাদের এইসব ভারি দুনিয়া থেকে বহুদূরে
ছোট্ট এই পাথুরে শহরটার পেটের ওপরে পার্ক: লা দেসা
অনেক উঁচু থেকে দেখলে
হলুদ আলো গিলতে গিলতে সে কখন শান্ত একটা চিতাবাঘ

পরিষ্কার আবহাওয়ায় ঘুমিয়ে রয়েছে

৯

ছুরির খেলায় উপচে উঠেছিলো জাদুকর,
তার সঙ্গে নেমে এসে যে ন্যাড়া উপত্যকায় এসে দাঁড়ালুম,
তাকে কি কোনোভাবে অনন্ত বলে ডেকে ওঠা যাবে?
শিস দিয়ে উঠেছে পুরনো ফেলে রাখা মৃৎ পাত্র,
হাওয়ার সঙ্গে গেলে আমাদের একান্ত নিভৃত চলা
মার খাবে ধরে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।
অনন্তের সান্ত্বনা মাটি,
সূর্যাস্তেরও বয়েস হয়েছে বলে
ঝপ করে নেমে আসা অন্ধকার
আমি কেন লিখি জাদুকর?

উপচে উঠেছিলে তো তুমি একা,
তোমার মাথা ফাঁক করায় আমাদের গ্রামের মেয়েদের
পেটে দেখা গিয়েছিলো নানা রকমের রঙিন পতঙ্গ শুয়ে আছে
পাশের অ্যালুমিনিয়ামের থালায় পরির ডানার পালকঃ সাদা ভাত,

আর এখন টিলার ওপর বসে ফসল ডাকছো তুমি
শেখাচ্ছো সমুদ্র, পৃথিবীর প্রথম মাতৃভাষা
আর যন্ত্রণায় সে বদলে নিয়েছে নিজেকে পাথরে
দ্বিতীয় ভাষা
পাতাদের হলুদ ইচ্ছেয় তৈরি আবহ
পিছন থেকে দেখলে তোমার পিঠটাই আস্ত চাঁদমারি

কয়েকশো ছুরির বাঁট কালো হয়ে গিঁথে আছে স্থির লক্ষ্যভেদে

১০

লেওনোর ইস্কিয়ের্দো নাম্নী বিশ শতকের গোড়ার এক কিশোরীকে

এইসব বিকেলবেলা হালকা হয়ে ওঠে গান
চটুল তামাশা থেকে কিছু দূরে মেঘ করে
শতাব্দি প্রাচীন ঘন্টা গির্জার ফোকর থেকে ঘুম ছিঁড়ে
বসে আছে ছন্দের ভেতর
অস্পষ্ট হাওয়ায় কাঁপে খড়খড়ি বুঝি একটু পরে ঝড়
আবছা আলোয় মুখ দেখে রাখছে কিশোরী
হলুদ ফল পোষ মানা অজস্র লন্ঠনে
দেয়ালে টাঙানো সব গোল আয়না
আসলে জঙ্গল থেকে ধরে আনা কুয়ো
নড়ে উঠছে জল
পাতা পড়লে এই বুঝি শিহরনে কাচ ভেঙে যাবে

১১

কতদিন হেঁটেছি শ্যাওলামাখা ভিজে ভিজে এলাকা
স্বাদে নুন সুর, গা বেয়ে নামা লালচে পাথুরে দৃষ্টিপথ।
মুহূর্তে উন্মুক্ত হয়ে গেছে সামনে দীর্ঘ মালভূমি, নাভি,
যোনিমুখ ঘেঁসে ওঠা জিভের শরীরে গমখেত, সদ্য কেটে নেওয়া ফসলের
গা দিয়ে চলে যাওয়া নভেম্বরের পপলার সকাল

লাফিয়ে উঠেছে নখ, স্বাদকোরকে জড়িয়েছে জ্বর
কালো বেরি, ঘামের নুন সমেত বাঁক নিয়েছে নদী
কতদূর কেটে নেওয়া ফসলের উদ্‌যাপন প্রশ্ন করলে
হাইওয়ের পাশে দূর টিলার ওপরে হলুদ দুর্গের
প্রতিরোধ আরও তীব্র

ফিরে আসছি চকিতে, সঙ্গে গিটার ড্রাম গভীর নাচ।
শিশির মাঠে ঘাসমুখ ডোবালে
বাহুর পাশ দিয়ে উঠে যাচ্ছে মসৃণ সকাল
ভেড়ার দলের মৃদু ঘন্টাধ্বনিতে স্থির ভেসে থাকা
লাল সবুজ উপত্যকা বরাবর
আমাদের আঁচড়, অর্ধচন্দ্রাকার

দীর্ঘ যাত্রার বাসের হাইওয়েতে পড়ার জন্য
প্রাগৈতিহাসিক জন্তু গুমরোনো
পাশে ব্যক্তিগত শিকারের জঙ্গল সমেত

বাইরে পাথর সন্ধের বাতাস দিয়ে তৈরি

কেন্দ্র তো শূন্য লিখে সরে গেলো কেউ, ভেসে রইল
পুরনো ব্যকরণের নিয়মের পাশে এই নিথর কমার রোমান আর্চ,
বাড়ি শিকার ঘড়ি পিয়ানো ইত্যাদি নিজস্ব অন্ধকার বিদ্যুৎ
গ্রীষ্ম আসতে ঢের দেরি এই হিজল জঙ্গলে
শিরদাঁড়া দিয়ে চলে যাওয়া দীর্ঘ দাবানলরোধী রেখা
বরাবর গজিয়েছে ঘাস

১২

কেঁপে গেছে একা থাকার পিঠ
খুব সন্তর্পণে রাত কাচ মেখেছে গায়ে
কেটে যায় গলি, কাফে, শনিবারের গিটার
কোনও স্ত্রী শরীরের গায়ে সাবানের ফেনা
পেপারব্যাকগুলো তাজা হাওয়া টেনে গোলাপী ফুসফুস

দীর্ঘ নগ্নতার মধ্যে গজিয়ে উঠছে একটা
উপগ্রহের পায়ে চলা শান্ত কক্ষপথ
একটাও অক্ষর জেগে নেই কিশোরী
হাতগুলো ভরে কাগজের পায়রা, আঠা

সারা গায়ে স্পর্শ বলতে পাহাড়ি মস
ঠাণ্ডায় হাত রাখলে উঠে আসবে গন্ধ পাথুরে বিশ্বাস
রাস্তার ধারের উঠোনগুলোয়
হেলাফেলা পাতার বন লাল
চলাচলে কোনও ছত্রাক মেশায় রেণু

আমাদের অতিদীর্ঘশ্বাসের দুনিয়ায় এই ধূসর দেশটি
একটি স্পেস স্টেশানের মত ভেসে আছে

চৌম্বকীয় বলের গায়ে সংসারও পেতেছে অনেকে
সংক্ষিপ্ত দুপুরে ফাঁকা চৌরাস্তার মাথায় চাঁদ
অনুভূতির পাশে পড়ে থাকা ব্যবহৃত কাগজের টুকরো

8ر

১৩

একটা সুতোও দেহে থাকলে চলবে না

না হওয়া কবিতাগুলো আমাদের চালাকি নিয়ে পালিয়েছে
নীলচে খাদের ভেতর নদীসাপে চকিতে গড়ালো পাথর
ওই উঁচু টিলা থেকে তারপর স্তব্ধতা, নীচে
পুরনো কবরখানার চাঁদ ছাই মাখাই হয়
বাড়ি ফেরার পর অনেকেরই সারা দেহে ঘিয়ের গন্ধ, আলোচাল
মাথার ভেতরে কালো শ্যাওলার ছোপ, পেঁচানো সিঁড়ি

আমরা প্রস্তুত টানটান
এই গোটা সময়টা অতিকায় ভারি একটা ট্রাক
মাড়িয়ে চলেছে ভোরের তুষারপাতের পিচ্ছিল পথ

আর্দ্র দিনে কাচের জানলায় নাক ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর
আবিষ্কার করে নেয় বাষ্পের হৃদয়
তারপর পরির আহত ডানা জল হয়ে মিশে গেছে
দৃশ্যটার ঠিক বাইরে ক্রমশ সমর্পণের ভঙ্গিমায়
দাঁড়িয়ে রয়েছে সমস্ত পাতা ঝরে যাওয়া পপলার

এইসব মেঘলা ভোরবেলায় ঈশ্বর আসলে নতুন বরফের গন্ধ

শান্ত নেমে আসছে এতদিন অপেক্ষায় থাকা
নগ্ন ও ন্যাড়া গাছগুলোর ওপর

১৪

সন্ধের আকাশ: কমলালেবুর কোয়ায় আলো ফেলছে শিশু
নীচে কাফেতেরিয়ার পাশ দিয়ে নেমেছে যে সব নতুন গলি
তাদের গায়ে মেঘলা বিকেলের ছলে পিচ্ছিলতা রাখি
পাশে নগ্ন নারীবাহু, লালা, শিহরন
পেছনের হলুদ আলো, সারা শরীরে ক্রমশ বাড়ছে
স্যাঁতসেঁতে মাশরুমের গন্ধ, পাইনের ঋজু ফাটল বরাবর
জিভ রাখছি বুনো অপেক্ষার

কিন্তু দুর্বল মানুষের ঘুমে বারবার হাত পা মেলে
তার চেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কোনও অস্তিত্ব
ভীত পশুর পেছনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সকাল হয়
মোটা ৪০ ফর্মার শীতকালের গায়ে বেঁটে প্রলোভন তাকে ডাকে
৪/৫ টা রোগা চরিত্র নিয়ে লেলিয়ে দ্যায় আখ্যান ময়দানে

দীর্ঘ তুষারপাতের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে
চৌরাস্তার বাজনদার একা
অর্ধনমিত তার আকোর্দেওনে উজ্জ্বল সবুজ মোম

১৫

থেমে আসা লেখা মারা যাবে জানতে পারা মানুষের অবিশ্বাস ছুঁড়ে
তাকিয়ে থাকে পাড়াটার দিকে
সবকটা জানলা দরোজা প্রাণপণ বন্ধ রেখেছে লোকে
নম্র তুষারের গায়ে বিশ্বাস রেখেছিলো যে সব কিশোর
তাদের হাত ভরে প্রজাপতি, নাভিমূলের কোমলতা
হলুদ একটা বড় রেশমী চাদর কেউ
চড়িয়ে রেখেছে দীর্ঘ মাঠে তারপর উঁচুনীচু ব্যাকরণহীনতা
পাথুরে বীজের গায়ে গজিয়ে ওঠা শ্যাওলা নামিয়ে আনছি বাক্যে
মেরুদণ্ডের ধূসর আলোয় নমনীয় ঘামের রেখা বরাবর
তৈরি হয় গোপন হিংস্রতার নতুন ক্যালেন্ডার
শরীর জুড়ে যে রেখার উপত্যকা তার দু পাশের পাহাড়ে
কোনও সূর্যোদয় রাখা নেই
কেবল মোমবাতির শিখায় উজ্জ্বল ভোঁতা টিলার শীর্ষ
আমি দাঁত বসাই

উপদ্রুতঃ যতিচিহ্ন, ফুসফুস বাষ্প, রক্তের গতি, বেস গিটার
লালা, শিহরন, বাকরীতি শনিবারের সন্ধে চক কোইয়াদো

অবতরণের বেলা শান্ত হয় নাকি?

১৬

পাথর মেখে শানিত দুপুর কাচ
এই শহরের দরজা জানলা মোটা আস্তরণে ঢাকা
কেউ এসে জোরে ধাক্কা মারেনি বলে
জমেছে সার্বিক তুষার

আরেকটু এগোই, গির্জার সামনের ভিক্ষে চাওয়া
রোমানিয়ার মেয়েটার হাতের তালুতে
বাসা করেছে ক্রিমসন ঋতু
ঠোঁটের সাদায় যতিচিহ্নহীন বাক্যের রুক্ষতা
শূন্য আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো এগিয়েছে বাজার ছাড়িয়ে
যেদিকে জনতা

শীতে ঢাকা চলাচল – ছোট্ট পাখিদের ঝাঁক
ক্রমাগত উড়ে নিজেদের উষ্ণ রাখছে
দৃষ্টিগোচর উপত্যকায় ন্যাড়া গাছ
পেছনে জ্যোৎস্নায় পতনশীল পালক:
বৃদ্ধার অপেক্ষার মত শান্ত লোকালয় ;

কেউ কি আসবে?

১৭

অকারণ হেসে ওঠার মেয়েরা এ অঞ্চলে নেই
হঠাৎ এসে পড়লে মনে হবে মাথার ওপর শুধু স্বচ্ছ মসলিন
রোগা যে সমস্ত কিশোরীরা এখান দিয়ে হেঁটেছিলো
তারা কি প্রত্যেকেই অক্ষর হয়ে উঠেছে?

এরপর ঢুকে পড়া নিজেরই যন্ত্রণায়
ভাবি কোনও বদ্রি পাখির ঝাঁক,
পরিত্যক্ত রঙের দোকান অথবা
ওই দূর চৌরাস্তা পর্যন্ত ফাগ ছিটিয়ে আছে
অগভীর চড়াইয়ের উড়ানে ঘোর লাগে

সুর আর পাথুরে বাতাস মিলে তৈরি করে চলেছে
এক আশ্চর্য আয়না ঘেরা একমুখো পথ
শেষপ্রান্তে বসে এক কাচের যুবক
হাতের আকোর্দিওন থেকে বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাস বাষ্প

১৮

চমকে উঠেছি বিস্তারেঃ যেন অতিদীর্ঘ একঘেয়ে দিন
সাদা বিরাট ডানা
মাথার ওপর অজস্র অক্ষর হয়ে উড়ে যাচ্ছে কালচে পাখির ঝাঁক
দূরে জমে যাওয়া রাস্তাটা দিয়ে রোমশ কুকুর নিয়ে হাঁটছে কেউ

আমি কি বন্ধু এইসব দৃশ্যসমূহের?

দীর্ঘ তুষারপাতের উঠোনে বিকেল আসলে
একটা খুব স্বচ্ছ নীলচে কাগজ
যাতে কোনওদিন লেখা যাবে না
শব্দের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে বাজারের খঞ্জ ভিখিরি
সুন্দরের পায়ের পাশে একটা জ্যাভেলিন,
বরফের ওপর গাড়ির চাকার দাগ বরাবর উঁচু হয়ে উঠছে
কান্নার শিকড়

বিঁধতে পারবে?

আর্যনীল ঃ শিরোনামহীন কবিতা - 'চামড়ার তলায়' যেহেতু... একটা শিরশিরে অনুভূতি জাগে কবিতাটা পড়লে। একটা চোরা অবচেতনা বইটা জুড়ে আছে। সেটা সুন্দর। তবে হয়তো খুব আবশ্যক নয় এসময়ে।

শুভ্র ঃ এগুলো আসলে বোধহয় ট্রান্‌জিশানের কবিতা। একদুনিয়া থেকে আরেকটায় যাবার সময় কিছু পুরনো চিহ্ন থেকে গেছে। আমি যখন জাদুপাহাড় লিখছি, তখন, ১০০% বহির্মুখী কবিতা শাসিত। মানে এক্‌স্‌ট্রোভার্ট। তার আগে এই অবচেতনা ছিলো। এখন আবার নতুন করে ইনট্রোভার্ট খুঁজছি। নিজের ভাষা তৈরি করার চেষ্টা। সেখানে ওই পুরনো লক্ষণগুলো ফিরেছে কোথাও কোথাও। একধরণের অব্‌সকিওর অনুভব থেকে লিখেছি এসব লেখা। মানে বিশ্বাসী মানুষের সমস্ত কবিতাই প্রায় এই ঘোরে লেখা। পরে লেখা চিতাবাঘ শহরে হয়তো এই অবচেতনার ব্যাপারটা নেই। পরে পড়লে হয়তো দেখতে পাবে এটা।

আর্যনীল ঃ মাঝে মাঝেই মৃত্যুর কথা এসেছে। খুব ধ্রুপদাঙ্গে। কিন্তু কেন? আমি মৃত্যুর কথা ভাবি কিন্তু লেখাতে কক্ষণো আসেনা। কেন জানিনা। আমার মনে হয় মৃত্যু, জীবন - এইসব শব্দ এত ব্যবহৃত যে এর পুনর্ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান থাকা জরুরি

শুভ্র ঃ মৃত্যু শব্দটা লক্ষ্য করো ওই ট্রানজিশানের লেখাগুলোতে আছে। কিন্তু যেখানে একুশ শতকের আমি হাজির সেখানে নেই। এমনকি বাবার মারা যাওয়ার অভিঘাতে লেখা ঘুমিয়েছো শব্দের ভিতরে-তে মৃত্যু শব্দটা নেই। চিতাবাঘ এ আছে। তবে সেটা যে অতি ব্যবহার জেনে তা বোঝা যাচ্ছে হয়ত। ধ্রুপদাঙ্গের কারণটা তো বলেই দিলুম। যেটা হয়েছে সেটা হল আন্তোনিও মাচাদোর উপস্থিতি। গভীর, খুবই গভীর কবিতা ওঁর। ওঁর মৃত্যুবোধ আমাকে খুব ধাক্কা দিয়েছে। সেটা এখন কাটিয়ে ফেলেছি। নতুন কবিতাগুলোয় মৃত্যু আসছে অন্য শব্দে। পরে দেখবে সে সব কবিতা। মৃত্যু আগে ভাবাতো না। এখন খুবই ভাবায়। তবে ধ্রুপদী জিনিশের প্রতি আমার একটা টান আছে। আমার সমস্ত কবিতায় যা কিছু চোরাটান তা ভাষার শরীরে। বাইরে থেকে দেখলে একদম ধ্রুপদী লিরিক কবিতার মত দেখতে অথবা ধ্রুপদী গদ্য কবিতার মত দেখতে (যতই বলি গদ্যে লেখা কবিতার

বয়সও দেখতে দেখতে ১২০ বছর হয়ে গেলো!) । এটা হিন্দুস্থানী ভোকাল থেকে নেওয়া। মানে বাহ্যিকভাবে একটা স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যাপ্রোচ আছে। তবে তোমার সঙ্গে লিরিক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এই জিনিসটা আরও উশকে উঠেছে।

আর্যনীল ঃ 'নিঃসঙ্গতা বিষয়ে' - শীর্ষক কবিতার প্রথম পংক্তিকে ভাঙছে ... এটা জন অ্যাশবেরি খুব করেন। তোর লেখায় প্রথম দেখলাম। ভালো হচ্ছে। 'অবলা'-র ওপর একটা চাপ আছে। এবং কুকুর অবলা জীব বলে 'বলার' বাসনা তীব্রতর হচ্ছে।

শুভ্র ঃ 'নিঃসঙ্গতা বিষয়ে' কবিতাটা সচেতন ভাবে পঙক্তি ভাঙতে চাওয়া। আমি অ্যাশবেরির ব্যাপারটা জানতাম না। নিতান্ত খেলার ছলে লিখে ফেলা।

আর্যনীল ঃ 'বিশ্বাসী মানুষের কথোপকথন' নিয়ে তো আগেই লিখেছি। মুগ্ধতা বজায়। এটা নিয়ে তুই কিছু বল। ওই দেয়ালে নুন দাগের ব্যাপারটা। এই কবিতাটা কিভাবে এলো, কোথা থেকে, এ বিষয়ে কিছু বল।

শুভ্র ঃ সোরিয়ায় একটা গির্জা আছে, সান ফ্রানসিস্কোর গির্জা। আমি যখন গত আগস্টে প্রথম পৌঁছই তখন সোরিয়ায়, তখন আমি এর খুব কাছে থাকতুম। এমনকি আমার রাস্তাটার নামও ছিলো *সান ফ্রানসিস্কোর হাঁটার রাস্তা* । প্রতিদিন দুবেলা এই গির্জার সামনে দিয়ে যাতায়াত করতুম। তা এহেন সান ফ্রানসিস্কোর গির্জাটা মোটেই গ্ল্যামারাস কোনও গির্জা নয়। রেলিখিওন কাতোলিকার দেশে এ দৃশ্য খুব বিরল। সান ফ্রান্সিস্কোর কপালে যে কোনও কারণেই হোক জোটেনি তার ২০০ বছরের বাইরের পাঁচিলটা সারানোর পয়সা। আমি দেখতুম অবাক হয়ে। আর এই গির্জাটাতেই আসেন বৃদ্ধ মানুষেরা। দীর্ঘশ্বাসের লোকজন। (জানোই তো ইওরোপীয় ইউনিয়ানের ঘোষিত বড় সমস্যা হল বার্ধক্য। মানে তরুণের সংখ্যা কম এবং এখানে সোরিয়া সবচেয়ে খারাপ জায়গায় আছে। এখানে বৃদ্ধ মানুষেরা জনসংখ্যার সিংহভাগ। এবং সোরিয়া জেলা ইওরোপীয় ইউনিয়ানের সবচেয়ে জনবিরল জেলা: প্রতি বর্গ কিমিতে ৪ জন করে লোক থাকেন!) তা হেন সান ফ্রানসিস্কোর সামনেই পার্ক লা দেসা, (আমার চিতাবাঘ, এই বিশ্বাসী মানুষের বয়ঃসন্ধির রাস্তা)। এই প্রতিদিনের যাত্রাটা আমার কাছে এক জটিল অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। সেইসময় আমি রেস্টোরেশান আর্ট নিয়ে একটা

ডকুমেন্টারি দেখেছিলুম। মনে হল এতগুলো মানুষ এখানে এসে কেঁদে যান, দীর্ঘশ্বাস ফেলে যান, মানুষের শাশ্বত বেদনা কি কোথাও আঘাত করে? চার্চ ল্যাটিনের নরম C কি একটুও প্রভাবিত হয়? পরে মনে হল, এই দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রু থেকে একধরণের নুন তৈরি হয়, যেগুলো ওইসব গির্জার দেয়ালচিত্রে আঘাত করে, জমে ওঠে, রেস্টোরেশান আর্টিস্টরা তাকেই সরিয়ে দেন।

আর্যনীল ঃ লন্ঠনের দোজখ, এও এক গা ছমছমে কবিতা। রহস্যময় কিন্তু নতুন উচ্চারণের কবিতা। তোর গোটা বইটা জুড়ে একটা শান্ত, সমাহিত রচনাচেতনা আছে। 'নতুন' কে মাটিতে পেড়ে ফেলার উচ্চকিতা কোথাও নেই। প্রথম পুরুষ বহুবচন কবিতায় বারবার আসছে। অনেক কবিতায়। এটা আমার 'সুনামির এক বছর পর' বইতেও আছে। আমার চোখে পড়েনি। বারীনদা এবং প্যাট প্রথম বলে। বারীনদার মতে সমাজচেতন হবার এটা একটা প্রয়াস। ঠিকই, যদিও অ্যাশবেরির প্রোনাউন প্লে-র প্রভাব এসেছিলো। তোর কবিতায় এই বহুবচন একটা দ্যোতনা তৈরি করে - *আমরা* কি সোরিয়া-র স্পেনীয়ভাষী 'আমরা' না আপামর বাংলাদেশের 'আমরা'। এ সম্বন্ধে তুই কি বলবি?

শুভ্র ঃ এই *আমরা* জিনিসটায় আবার হাজির হিন্দুস্থানী ভোকাল সঙ্গীত। এটা *সামাজিক* দিকে যেতে চাওয়া তো বটেই। *আমরা* আমার কবিতায় এসেছে অনেকদিন। *জাদুপাহাড়ের গান* এর অনেক কবিতাতেই তা আছে। সেটা এখানেও চলে এসেছে। আমার কাছে এই উপস্থিতি একেবারেই সামাজিক। এককের সামাজিক হয়ে উঠতে চাওয়ার মত একরৈখিক ব্যাখ্যা দ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। নেরুদা পড়াতে গিয়ে। যদিও নেরুদার ক্ষেত্রে *আমরা* নেই। আছে *আমি* যে কোনও দূর অতীতের কোনও ঘাসের মত মানুষকে ডাকছে নেতার হাত বাড়িয়ে! বিশ শতকের সামাজিক কবিতা একটি ব্যর্থ জঁর মুখ্যত এই কারণে। যেখানে কবির ইগো শেষ হয়নি। সে নেতার মত, মঞ্চে উঠে ডাকছে। এখানে প্রকৃত *আমরা* নেই। আমার কবিতায় যে *আমরা* তার কোনও দেশ নেই। সেই সমষ্টি দুনিয়ার যে কোনও প্রান্তের *আমরা*। যারা ঘাসের মত। যাদের কোনও বলার মত কিছু নেই। অংশ নিতে পারার ক্ষমতা নেই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকাবার মত দেয়ালটাও নেই। কিন্তু অত বড় করে ধরতে পারিনি। কিন্তু পারতে চাই। আমি একা নই, আমার মত ঘাসজীবন অনেকেই কাটান এই ঘনবসতির দেশে। হয়ত সিংহভাগ মানুষই কাটান।

এই *আমরা*-কেই কথা বলাতে চাওয়া।

আর্যনীল ঃ 'আমাদের' মেয়েগুলি তো দীর্ঘাঙ্গী নয়, অথচ স্তোত্র বলে... তবে এরা কাদের মেয়ে?

শুভ্র ঃ হা হা! এখানেই মজা। দ্যাখো আমাদের মেয়েরা দীর্ঘাঙ্গী নয়, কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে আমার নিজের অবসেবসেশান । তার জাত নেই! তবে যে জাতিরই হোক, সে যে স্তোত্র বলে তার অন্বয় ভাঙা! মাথামুণ্ডুহীন ছেদ যতি চিহ্ন। এখানে আমার প্রথাগত শিক্ষা কাজ দিয়েছে। আমাদের ভাষার অন্বয় বা সিনট্যাক্স হল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্বয়। আমরা ইংরেজি দিয়ে বুঝতে চাইলে একটু ঘুর পথে বুঝতে হবে। কিন্তু লাতিন থেকে তৈরি ভাষাগুলোয় এর চিহ্ন আছে। এবার আমরা যারা ঘাসজীবন কাটাই তাদের মুখের অনেক অন্বয় ভাষাতত্ত্বের সূত্রের ব্যতিক্রমের মত। এই অন্বয় অসংস্কৃত। এই অন্বয় এলিটের তৈরি ব্যকরণের নয়। আমরা যারা এলিট নই, তারা চিনি এই ভাঙা অন্বয়। নিরক্ষর বিহারি মেয়েদের স্তোত্র বলে চলা। ছট পুজোর গান। আমাদের ভাদু গান। যাঁরা গানের কথা জানেন তাঁরা তো গাইছেনই। কিন্তু অনেক লোক পেছনে আছে যাঁরা শুধু ঠোঁট থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ভাঙা ভাঙা বাক্য। অথচ সুরটা আছে। এই একই জিনিশ আমি দেখি সোরিয়ায় আফ্রিকার মেয়েদের মধ্যে। আমার হস্টেলে একটি মেয়ে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করতো। সে *সি* আর *নো* ছাড়া একবর্ণ এস্পানিওল জানতো না। কিন্তু সে হস্টেলের পার্টিতে এস্পানিওল গানে ঠোঁট বোলাতো। একটা দুটো শব্দ। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান একে বলবে ভাঙা অন্বয়। কে জানে ভারতের আদি ভাষাগুলোর অন্বয় কেমন! কিন্তু ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্বয় ১০০% এলিট। সাহেব আর আর্যদের বাক্যবিন্যাস। আমাদের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে।

আর্যনীল ঃ জাদুবস্তবতার কথা এই বই প্রসঙ্গে উঠবেই। এই ব্যাখ্যাকে তুই বইয়ের অলঙ্কার হিসেবে ধরে রাখতে না চাস না এটা তোর ব্যাপার। যেমন রজতেন্দ্র-র কবিতায় এটা খুব আসে। গদ্যগন্ধী জাদুবাস্তবতা। কথ্যভাষায়। তোর লেখায় সেটা কবিত্বে ভরপুর, রহস্যময়। যেমন মৃত সাদামথের পাযে ছুরি কেন? সামান্য মৃত্যু কে বড় করে দেখানো নাকি বৃহত্তর আসন্ন মৃত্যু কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে ? এই প্রশ্ন পাঠকের মনে আসবে।

শুভ্র ঃ না এখানে জাদুবাস্তবতা নেই। যে রহস্যময়তা আছে তা আমাদের দেশজ। দ্যাখো জাদুবাস্তবতার সংজ্ঞা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কতগুলো লক্ষণকে চিহ্নিত করে -

১. জাতির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘটনার সঙ্গে তুচ্ছ ব্যক্তিজীবনের কোনও ঘটনার সমাপতন। যেমন ধরো রুশদির মিডনাইট্স চিলড্রেন-এ সালিম সিনাই এর জন্ম হচ্ছে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এ।

২. সময়কে প্রচলিত ফ্রেমে না ধরা। অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানকে ঘেঁটে দেওয়া। এই একটা ব্যাপার আমাদের দেশজজীবনে ভর্তি। যাঁরা ভূতে বিশ্বাস করেন, যাঁরা কোনও বিশেষ বাবার শিষ্য। তাঁরা তো সময়ের ফ্রেমকে ঘেঁটে চটকে এক করে দেন। এই জিনিশটাকেই আলেহো কার্পেন্তিয়ের প্রথম ব্যবহার করেন। পরে লাতিন আমেরিকার বুম এর সময় তাকে চিহ্নিত করে শনাক্ত করে হিট বানিয়ে তোলা হয়। কিন্তু এ জিনিশ আমাদের মত দেশগুলোতে আগে থেকেই ছিলো। আমি এস্পানিওল সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে নয়, একজন তরুণ লেখক হিসেবে, বুম এর বাইরের লেখাপত্রেই আগ্রহ বেশি। বা বুম এর মাইনরদের লেখায়। কারণ বুম কেন তা নিয়ে এখন অনেক দ্বন্দ্ব আছে। তবে জাদুবাস্তবতা একেবারেই উপন্যাসের জিনিস। বুম এর কবিতায় তা কখনও আসেনি (নেরুদা, বাইয়েখো, পাস, পার্‌রা, কেউ নন) । পরেও আসেনি।

এবার আসি আমার লেখার প্রসঙ্গে। তুমি যেটাকে জাদুবাস্তবতা বলছো সেটা হয়ত আমার কবিতার রহস্যময়তা। এটার সঙ্গে যোগ আছে দেশজ জিনিশের। লক্ষ্য করবে আমার কবিতায় স্থান-কাল বোধটা ইওরোপীয় স্থান কাল বোধ নয়। এবং লাতিন আমেরিকার স্থান কাল বোধও নয়। এটা উর্দু সাহিত্যের স্থান-কাল বোধ। লক্ষ্য করবে আমার কবিতায় সময় বা কাল খুব ছোট। আর সেখানে আমি চেষ্টা করেছি অনেক জিনিশ ঢুকিয়ে দিতে। এটা গজল থেকে পাওয়া। প্রত্যক্ষ ঋণ মির্জা গালিব। মথের পাশে ছুরি আসলে মরে যাওয়াকে জোর দেওয়া হয়ত। জানি না ঠিক। এটা স্বপ্নে পাওয়া!

আর্যনীল ঃ পুরনো শহর যেমন পাথরে ভরা হয় বুঝতে পারছি সোরিয়া সেইরকম। এটা কোন ছবি না দেখে তোর কবিতা পড়েই বুঝতে পারছি। ফলে পাথর একটা যুগের প্রতীক হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। এখানে ইভ বনফোয়া-র কবিতা প্রচণ্ড মনে হবে। কখনো ওর একটা বই পড়িস। Pierre Ecrite। মানে প্রস্তরলিখিত। পাথরের অজস্র অর্থ ওর কবিতায়। Its a metaphysical foil

শুভ্র ঃ পাথর নিয়ে আমার অবসেশান অনেকদিনের। আমার কৈশোর কেটেছে শিলিগুড়িতে। গোটা দার্জিলিং জেলা ও তার প্রস্তরসমূহের একটা স্থায়ী ছাপ ওই পাথর! আমি বনফোয়ার বইটা পড়িনি। পড়ে ফেলবো খুব শিগগির। বনফোয়ার রাঁবো নিয়ে কাজটা খুব ভালো লেগেছিলো। আমার কাছে পাথরের একটা অধিবৈদিক বা মেটাফিজিকাল চেহারা আছে। আমি একটা পাথর হয়ে উঠতে চাই। এবং দেখতে গেলে আমরা যারা ঘাসের মত মানুষ তারা সংসার নামক বিরাট পার্বত্যপ্রবাহের পাশে নুড়ির মত অকিঞ্চিতকরভাবে পড়ে থাকি। অব্যক্ত।

আর্যনীলঃ একটা কথা হঠাৎ মনে হলো। সোরিয়া পুরাতাত্ত্বিক শহর, সেই পুরাতত্ত্ব তোর কবিতার আবহে কিছুটা এসেছে বলে মনে হয়। 'পাথর' এর বিবিধ ব্যাবহার একটা প্রমাণ। হয়তো আরো আছে পারিবেশিক ঐতিহাসিকতা কিভাবে/কতটা কাব্যভাষা ও ভাবনায় সঞ্চারিত হয়েছে, এই ঐতিহাসিকতা নিয়ে তুই কি ভেবেছিস

শুভ্রঃ এটা খুব জটিল একটা এলাকা। এই বইটার সর্বত্রই সোরিয়ার প্রাচীন গড়ন ছড়িয়ে আছে! পাথর, রাস্তা, গির্জা থেকে শুরু করে ভায়োলেন্স গুচ্ছস্বপ্ন নামক একটা আস্ত কবিতায় সশরীরে হাজির সোরিয়ার ইতিহাস, যা কিনা এস্পানিয়ার ইতিহাসে এক প্রতিরোধ এর প্রতীক। রোমানরা যখন সারা ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করছিলো, তখন এস্পানিয়ার এক ছোট্ট জনপদ নুমান্সিয়া রোমানদের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়ায়। কতকটা অ্যাসটেরিক্স-এর মত। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলে। শেষে যখন পরাজয় আসন্ন তখন গোটা জনপদ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সেই নুমান্সিয়াই আজকের সোরিয়া। বর্তমান সোরিয়া শহর থেকে ৪ কিমি দূরে সেদিনের নুমান্সিয়ার ধ্বংসাবশেষ। সোরিয়ার সেই প্রতিরোধী স্পিরিট আজও আছে। সেই ভাববিশ্ব আমার কবিতায় এসেছে।